যৌতুক ও উত্তরাধিকারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড: মুহা: মুশতাক কারীমী

অনুবাদ: মোঃ তাহেরুল হক

যৌতুক ও উত্তরাধিকারের ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মূল - ড: মুহা: মুশতাক কারীমী

অনুবাদ: মো: তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট

কলকাতা-১৩

প্রকাশক:
বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭ বি লেনিন সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২১

বিনিময়: ১২ টাকা

মুদ্রণে: মিমঝিম বুক বাইন্ডিং
কলকাতা-৭০০০০৯

Joutuk O Uttaradhikare Islami Dristikon
Dr. Md. Mushtaq karimi
Translate: Md. Taherul Haque
Published by: Bangla Islami Prakasani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 -013
Printed by: Mimjhim Book Binding
Kolkata-700 009
Price RS. 12/- only

ভুমিকা

আধুনিক সমাজে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গাইস্থে হিংসা বাড়ছে। পারিবারিক বিদ্বেষ বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে কোর্ট কাচারীর দরবারে গিয়ে ঠেকেছে। বিবাহে কন্যা পক্ষের কম পণ দান, এক মারাত্মক লোভ-লালসার জন্ম দিচ্ছে। নারী নির্যাতন, বধুহত্যা, আত্মহত্যার উৎস হিসাবে এই ব্যাধি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়া কন্যা যা নারীকে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ছল-চাতুরি আত্মীয়রা করে থাকে।

এমন প্রেক্ষাপটে ইসলাম এই রোগ নির্মূল করার কার্যকর পন্থা দেখিয়েছে। বিষয়টির গভীরে গিয়ে মূল্যায়ন করে তার উৎস সন্ধান করা হয়েছে এবং তার কুফল সম্পর্কেও সতর্ক ক'রে প্রতিরোধের দিক নির্দেশনাও দিয়েছে। আসল কথা হলো, এমন জঘণ্য সামাজিক সমস্যার সমাধান কল্পে পূর্বেও সমাধান দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়েছে। তাই আজ এই মারাত্মক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামের নীতিমালার দিকে তাকালে সার্বিক ফললাভ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

মো: তাহেরুল হক
(অনুবাদক)

ভারতীয় মুসলিম সমাজ, নানা রকম কুপ্রথায় জর্জরিত। এ সব এসেছে গতানুগতিক ধারায় এবং প্রতিবেশী অমুসলিম সমাজের প্রভাবেও। এর মধ্যে একটি হলো যৌতুক প্রথা। যৌতুক প্রথা অভাবনীয় পদ্ধতিতে সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। ফলে সামাজিক জীবনের অনেক মূল্যবোধই নষ্ট হয়েছে- ইসলামী নীতিমালাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। যৌতুক প্রথা আজ এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের নেতৃস্থানীয় নানা মহলেও জাঁকিয়ে বসেছে। বিবাহ কেন্দ্রিক সকল কুপ্রথার অন্যতম উৎস হিসাবে যৌতুককে বলা যায়। কেননা এই সময়ের সব চেয়ে কষ্টকর প্রথা হওয়ায় তার পরিণতি হচ্ছে ভয়ংকর । আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রাচীন কাল থেকেই কেবল ভারতীয় সমাজে এই প্রথা চলে আসছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়ও। কেউ কন্যাদানও বলেন। যৌতুক আরবী (جهيز جهز) 'জাহীয' থেকে নির্গত, যার থেকে (تجهيز) তাজহীয -যার সারকথা মৃতের দাফন কাফনসহ শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা।মৃতের শেষ কৃত্যের পর তার সম্পর্কে দায় শেষ করার ন্যায় কন্যার বিয়েতেও যৌতুক দিয়ে এক রকম শেষ বিদায় জানানো হয়। আরবী শব্দ' জাহ্ য'-এর অর্থ আসবাব সামগ্রী প্রস্তুত করে দেওয়া। বরের জন্য নতুন ভাবে সংসার গড়ার সামগ্রী হিসাবে দেয়ার জিনিস পত্রের নাম জাহীয বা যৌতুক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এর এক একটা নামও আছে। এমন প্রথা কেবল ভারত ভিন্ন কোন দেশে পাওয়া যায় না। যৌতুকের সকল ধরণ অমানবিক, অনৈসলামী। বিবাহের জন্যে ইসলাম পাত্রকেই সকল প্রকার আর্থিক দায় বহন করার নির্দেশ দেয়। যেমন হাদিসে আছে:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

'হে যুব সমাজ! তোমাদের যারা ঘর সংসার করার সামর্থ্য রাখ, বিবাহ কর।' (মিশকাত)

ঘর সাজানো, বিবাহের ব্যয় বহন করা ও স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা, বিয়ের সময় স্ত্রীর মোহর আদায় করা বরেরই দায়িত্ব। বিবাহের পর অলীমা (বা প্রীতিভোজ) করার দায়িত্ব বরের উপর বর্তায়। এই সমূহ ব্যয় ভার বহন

করা সম্পূর্ণ ভাবে পাত্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, -পাত্রীর অভিভাবকের উপর নয়।

ফেকাহ শাস্ত্রকারগণ এর নানা শাখা বর্ণনা করেছেন। যার মূল কথা হলো, বিবাহের জন্যে সকল প্রকার ব্যয় বহন করবে পাত্রই। হানাফী ফেকাহর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম 'যাহ্রা'- বলেন: ঘর ও ঘরের আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। বিবাহেচ্ছুক পাত্র তার সংসার জীবনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। এটাকে বলে যৌতুক, যার আয়োজনের দায়িত্ব পাত্রের। এর সংগে মোহরের তূলনা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা তা স্ত্রীর জন্য উপহার মাত্র। কুরআন একে দান (نحلة নেহলা) হিসাবে উল্লেখ করেছে। এটা সম্পূর্ণ ভাবে স্ত্রীর নিজস্ব অধিকার। স্বামী এই অর্থে ভাগ বসাতে পারে না। শরীয়তের কোথাও এমন কথা নেই যে ঘর সংসার সাজানোর দায়িত্ব পাত্রীকে করতে হবে। (আল আহ্ওয়ালুল শাখসিয়্যা-পৃ- ২৩৮)

কোন কোন ফেকাহবিদ বলেন, পাত্রীর পক্ষে উপহার হিসাবে কিছু দিলে দেওয়া যেতে পারে, এটা নিছকই উপহার হিসাবে বিবেচ্য হওয়ার বৈধতা আছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রচলিত যৌতুক প্রথার কোন দলীল বা যৌক্তিকতা নেই। প্রচলিত যৌতুক প্রথা এক্কেবারে অভিশাপ। সমাজকে বিশৃংখলায় ভরে দেয়। এটা এখন গৃহ সামগ্রীর পর্যায়ে নেই বরং আভিজাত্য, অপচয়, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার নিদর্শন হয়ে গেছে। ফ্রিজ, টিভি, গাড়ী, ফ্লাট ও কত রকম আমোদ প্রমোদের বিলাস বহরে ঠেকেছে। যেহেতু সমাজের প্রথা, তাই শত কষ্ট হলেও আর্থিক দুর্বল ব্যক্তিও তার আয়োজন করতে পেরেশান হচ্ছে। অনেক সময় এমনও হয় যে পাত্রীর অভিভাবকের জমি, বাস্তু, ঘর বাড়ী বিক্রয়-এমন কি মহাজনের কাছে সূদ করেও অর্থ সংগ্রহ করতে বাধ্য হতে হয়। দেনা করা কঠিন নয় কিন্তু তা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক অঘটণ ঘটে। পাত্রী পক্ষ ভারী যৌতুকের সাথে অন্যান্য যৌতুকও দিতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া আছে বিয়ের আনুসঙ্গিক ব্যয় ও বর-যাত্রীর আভিজাত্য পূর্ণ ভোজনের সাথে একাধিক ব্যয়ভার বহন করা।এই যে অপচয় ! ইসলাম এটাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। কোন ভাবে অপব্যয় ও অপচয় করার অবকাশ রাখা হয়নি। (দ্র: ১৭:২৬-২৭) যত দিন যাচ্ছে, পাত্রের অবস্থা, শিক্ষা ও সামাজিক মান অনুযায়ী যৌতুকের বহর বাড়ছে। পাত্রী পক্ষ নগদ মাল কড়ি দিয়ে এক সময় পাত্রকে প্রায় কিনে নেয়। মানুষ-ডাক্তার, উকিল ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারী চাকুরীজীবি হিসাবে পাত্রের সন্ধানে থাকে। তার জন্য ব্যাংক ব্যালেন্সও করতে হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ একটি এবাদত। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনের ভিত গড়ে ওঠে। রাসূল ﷺ বলেন :

افضل النكاح بركة ايسرها مؤنة

'উত্তম বিবাহ হলো, যে বিবাহতে সর্বনিম্ন ব্যয় হয়-তাতে বরকত আছে।' এর অর্থ- মানুষ বিপদে পড়ে না।

যৌতুক প্রথার প্রচলনের জন্য সমাজে অপচয়ের মাত্রাও বেড়েছে। লোভ লালসাও বেড়েছে। যৌতুকের আশায় অতি উত্তম সম্বন্ধ খোঁজে। দ্বীনের সম্বন্ধ খোঁজা বৃথা মনে করে। লোভের সীমা নেই। যত দেওয়া হোক, লোভী আরও আশা করে থাকে। লোভে পাপ পূর্ণ হলেও আরো চাই চাই করে। প্রত্যেক মানুষের সক্ষমতারও একটা সীমা থাকে। চাহিদার সব আশা পূরণ করা সম্ভব হয় না। অবশেষে কেবল যৌতুকের জন্যই তালাক বা বিচ্ছিন্নতা আসে। আত্মহত্যা, খুন ও বধূ হত্যার ঘটনা ঘটে। আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায় এর অজস্র নজীর আছে। নিছক যৌতুকের চাহিদা পূরণ করতে না পারার জন্য নববধূর বিষ পান করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিবাহের সময়ের অঙ্গীকার পূরণ করতে বিলম্ব হওয়ায় বধূকে খুন করা হয়, আগুনে পুড়ে মরতে হয়। আজকের সমাজ জীবনে যৌতুক প্রথা মহামারীর আকার ধারণ করায় নিত্যদিন হত্যা, অগ্নিদাহ, বিষপান জাতীয় দুর্ঘটণা ঘটে চলেছে। কারণ? যৌতুকের ভয়াবহতা। বিবাহ ব্যবস্থা, জীবন গড়ার চেয়ে জীবন নাশের মাধ্যম হচ্ছে। যৌতুকের ব্যবস্থা করতে অপারগ হলে কন্যার বিবাহের বয়স উতরে যায়ও। তাই এমন পরিস্থিতিতে এই কুপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য ব্যাপক প্রচার ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। এ সমস্যা কেবল যৌতুক দাতার, যৌতুক গ্রহিতারও। কেননা যেভাবে নিচ্ছে, তেমনি নিজের কন্যা ও বোনের ক্ষেত্রেও দিতে বাধ্য। এ ভাবে সমান্তরাল ভাবে আজ যে অত্যাচারিত হচ্ছে, সে পরবর্তীতেও অত্যাচার করতে দায়বদ্ধ হচ্ছে। আজ যে যালেম, কাল তাকে মযলুম হতে হবে। তাই বিষাক্ত পরিবেশ বদলানোর উপায় কি? একটাই পথ যে, সমাজের সুশীল শ্রেণীর সম্মিলিত উদ্যোগে পাপের দেবতাকে ধূলিসাৎ করে শয়তানের চক্র থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারে। যৌতুক দেওয়ার পক্ষে কতক ব্যক্তি অমূলক ভোঁতা যুক্তি পেশ করে বলেন যে, এটা জায়েয। কেননা খোদ রাসূল-ﷺ তাঁর মেয়ে হযরত ফাতেমাকে যৌতুক দিয়েছেন। এটা একটা ভ্রান্তিসহ পাপের বোঝা বওয়ার সমান। আল্লাহর নবীর উপর যৌতুক দেওয়ার অপবাদ চাপানো। রসূলের তো আরো তিনটি কন্যা ছিল। তাদের বিয়ের সময় এ রকম কিছু দেওয়ার কোন প্রমান তো নেই। তা ছাড়া তাঁর অসংখ্য স্ত্রীদের কাউকে কিছু দেনা পাওনার কোন হদীস নেই। কেবল ফাতেমার বিয়ের ক্ষেত্রে এমন কথা পাওয়া যায়। তার সদুত্তর হলো-ঐ সামান হযরত আলী-র অর্থেই কেনা হয়েছিল।এটা আদৌ যৌতুক নয় বরং স্বামীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। এটাই সঠিক তথ্য। হযরত আলী যখন বিবাহের প্রস্তাব দেয়,তখন

রাসূল-ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন,তোমার সংসার বহন করার মতো কিছু আছে? তিনি বলেন, একটি বর্ম ভিন্ন কিছু নেই। সেটা এনে হাযির করেন। রাসূল-ﷺ তা বিক্রির জন্য হযরত আবু বাকরকে দেন। তিনি তা বিক্রি করে একটি চামড়ার বালিশ,কালো ইয়ামানী চাদর,খাটিয়া,পানির কলসী,খোশবু ও একটা কাপড় কিনে অবশিষ্ট অর্থ তাকে ফেরত দিলে তা মোহর হিসাবে ফাতেমার বিয়েতে দেন। (শারহে মাওয়াহিব ২/৩-৪)

এই ঘটণা থেকে প্রমান হয়, হযরত আলীর বর্ম বিক্রির অর্থে তার জন্য আসবাবপত্র কেনা হয়েছিল। এর সাথে যৌতুকের কোন সম্পর্ক নেই। প্রশ্ন আসে অন্য মেয়ের বিয়েতে কিছু না দিয়ে কেবল ফাতেমার জন্য এ রকম করার কারণ কি? সহজ উত্তর হলো- আসলে আবু তালেবের সংসারে পুষ্যি সংখ্যা বেশী থাকায় রাসূল-ﷺ আলীকে বাল্যকাল থেকেই নিজের সংসারে শামিল করেন। কাজেই প্রথম থেকেই সে ছিল রাসূল-ﷺ পরিবারেরই সন্তান তূল্য একজন। যখন বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে,পৃথক ঘরের প্রয়োজন। তাই তার অর্থেই তার ঘরের সরঞ্জাম কেনার ব্যবস্থা হয়। এটা ঠিক আজকালের যৌথ পরিবার থেকে সংসারে পৃথক হওয়ার ন্যায়। যৌতুকের বৈধতায় দ্বিতীয় প্রমান হিসাব বলা হয়, ভারতে পিতার সম্পদে কন্যার কোন অংশ ছিল না,তাই যৌতুকের মাধ্যমে তাকে কিছু পূরণ করা হয়। এটা অবান্তর যুক্তি। কেননা--

১) ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ আসে। জীবদ্দশায় কন্যাকে দেওয়া যথেষ্ঠ মনে করা অযৌক্তিক, অবৈধও।

২) উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। তাতে বেশী কম করার কোন অধিকার কারো নেই। অনুমান করে কিছু অংশ কন্যাকে দেওয়া অন্যায়। মৃত্যুর পর কন্যা ন্যায্য অংশ পাবে। কাজেই যৌতুক উত্তরাধিকারের বিকল্প নয়।

আবার বলা হয়, বিয়ের সময় পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষকে উপহার হিসাবে কিছু দেয়। প্রথম কথা হলো, যৌতুকে যা দেওয়া হয়,উপহারে তা দেওয়ার চলন নেই। যৌতুকে বরং খাটগদী, ফ্রিজ, টিভি,গাড়ী দেওয়ার চলনে উঁচু মানের বিনিময় হয়। কেউ বলতে পারেন, যৌতুক হিসাবে কিছু চাওয়া উচিত নয়। কিন্তু খুশী হয়ে কেউ দিলে তাতে আপত্তি কোথায়? এটাও এক রকম ঘুরিয়ে আদায় করার শামিল। সমাজ এমন হয়ে গেছে যে, বিয়ের সময় রসম অনুযায়ী যৌতুক দিতে হয়। তাতে পাত্রী পক্ষের বোঝা যতই ভারী হোক। মনের সুপ্ত বাসনায় পাত্র পক্ষ কিছু পাওয়ার জন্য কাঙ্খিত থাকে। না-পেলে ক্ষুব্ধ হয়। ফেকাহ শাস্ত্রের প্রবাদ আছে: 'সমাজে যে জিনিসটার চলন আছে,

তার উল্লেখ না করলেও প্রাপ্ত হয়ই'। যারা যৌতুক গ্রহণ করে তাদেরও উচিত, এর থেকে নিজেদের বিরত রাখা। এমন জঘণ্য প্রথা, পূর্ণ ভাবে বন্ধ করতে হলে যারা খাঁটি ঈমানদার বলে--তাদের দ্বীনী ও নৈতিক কর্তব্যও এটা।এই বিপর্যয় রোখার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সবাই যৌতুকের আশায় থাকে না। সমাজের সচ্ছল ব্যক্তি যখন যৌতুক প্রথার বিলোপ সাধনে আগিয়ে আসবে, তার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সমাজে নিজের আভিজাত্যের প্রভাব বিস্তার না করে যারা সমাজ গড়ার কারিগর হতে চাইবে, আজ তাদের নির্ভীক উদ্যোম এক সময় সমাজের পাপ ক্ষয় হওয়ার কারণ হবে। সমাজের যারা মনে করে যে, নিজের ছেলের বিয়েতে যেভাবে প্রচুর ব্যয় করেছে, যদি বৌমার অভিভাবকরা যৌতুক হিসাবে তেমন কিছু দেয়,তাহলে সংসারের ঘাটতি পূরণ হতে পারে, এমন ব্যক্তিরা যেন রসূলের সতর্ক বাণী স্মরণ রাখে যে, 'যারা সম্পদের লোভে বিবাহ করে, আল্লাহ তাদের দারিদ্র্য ত্বরান্বিত করেন।' উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া-দুটোই পাপ। বিবাহের ন্যায় পবিত্র সম্বন্ধকে কলুষিত করে। দরিদ্র ব্যক্তির জন্য কন্যাদায় গ্রস্থ হতে হয়। যৌতুকের বাজারে সমাজে অপচয় বাড়ে। পাত্র-পাত্রীর উভয় পক্ষের আর্থিক তছরূপ বাড়ে। যখন আর্থিক সক্ষমতা না থাকে, তখন বিবাহে বিলম্ব ঘটায় সমাজে ভিন্ন বিপদ আসে। যৌতুকের কারণে সমাজে কত মেয়ের খুন, অগ্নিদাহ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কত জনের পবিত্র বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। সকল যুগের ওলামাগণ যৌতুক যে নিষেধ,তা স্পষ্ট করেই বলে গেছেন। ফতোয়া আলমগিরীতে সাফ করে বলা হয়েছে :-

لا يجوز ان تجبر المراءة على ان تتجهز اليه بشيء اصلا لا من صداقها ولا من غيره من ساءر مالها و الصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت (عالمگيرى /

যৌতুক আনার জন্য পাত্রীকে কোন ভাবে বাধ্য করা যাবে না। তার মোহরে হস্তক্ষেপ বা তার বাইরেও কোন অর্থের চাপ নয়। মোহর তো তার নিজস্ব সম্পদ। (আ: গীর ১/৩১৭) চার মযহাবের সমন্বয়ের ফেকাহ গ্রন্থে আছে - 'কেউ এক হাজার অর্থের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার অভ্যাস মতো আশা পোষণ করলো যে, এবার যৌতুক হিসাবে সে কিছু নিয়ে আসবে। এমন মহিলা যৌতুক হিসাবে কিছু যেন না নিয়ে আসে। স্বামীর দায়িত্ব যে, সে তার স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সামানপত্রের ব্যবস্থা করবে। (আল ফিকহু আলা মাযাহাবিল আরবাআ- ২/১৭৬) ইমাম ইবনে হাযাম আন্দালুসী বলেন: স্ত্রীকে যৌতুকের জন্য বাধ্য করার কোন অবকাশ নেই। তার মোহরের ব্যবহারের হকও তার। তাতে হস্তক্ষেপ করাও জায়েয নয়। (মুহাল্লা ২/১৭৬)

যৌতুকের আর এক প্রকার হলো বরপণ আদায় করা। পাত্রীর পক্ষের নিকট থেকে দামী দামী জিনিসপত্র আদায় করে বিলাসিতা করা হয়। এটারকে ঘৃণা করে মাওলানা বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী লিখেছেন: যৌতুকের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রথা হলো বরপণ আদায় করা। এতে বরকে এক রকম কেনা হয়ে যায়। পাত্রের সামান্য আত্মমর্যাদা থাকলে এভাবে নিজেকে হেয় করে না। এই জন্যই মিল্লাতের ওলামা ও সমাজ সচেতন সুধী ব্যক্তিগণের কর্তব্য হলো, সামাজিক এই বিষবৃক্ষকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা। কেননা আল্লাহ বলেন,

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

'দূরে থাক সেই ফেতনা হতে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষ ভাবে কেবল সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না- তোমাদের মধ্যে যারা গুণাহ করেছে।' (সূরা আন'আম: ২৫)

সমাজের এমন জঘণ্য রসম রেওয়াযের ক্ষতিকর প্রভাব দেখেও সুশীল ব্যক্তিগণ এবং ওলামা সমাজ কখনো নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। এটা সীমা অতিক্রম করায় হাজার হাজার কন্যা অবিবাহিত থেকে যায় বা বিবাহে বিলম্ব হয়। অনেকে আত্মহত্যা করে কিংবা ধর্মান্তরিত হয়ে বিবাহ করতে বাধ্যও হয়। বাস্তবের করুণ চিত্র উপলব্ধি করে সমাজের দায়িত্বশীলগণের যথাযথ ভুমিকা পালন করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। (যৌতুক ও নগদ অর্থ আদায়, পৃ-২৩)

প্রোফেসর ওমর হায়াত খান গৌরী লেখেন: আমাদের সচ্ছল পরিবারের বিলাসিতার দরুণ সমাজে নানা রকম বিশৃংখলা জন্ম নিচ্ছে। পাত্র পক্ষ বিয়ের প্রস্তাবের আগে ভাবে পাত্রী পক্ষের থেকে যৌতুকের সামান কেমন পরিমাণে আসতে পারে। আবার অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের পাত্রও ধনী পরিবারে বিবাহের সম্বন্ধ করতে চায়। ফলে দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের বিবাহে ব্যাঘাত ঘটে। যৌবন সীমাতিক্রম করলেও স্বামীর ভাগ্য হয় না। তৃতীয় সমস্যা হলো, দরিদ্র পাত্রী পক্ষের সাধ্যের বাইরে গিয়ে যৌতুক সংগ্রহ করতে হয়। ফলে সূদ বা নিতান্ত সম্বল ভিটে বাস্তুও বিক্রি করে পরবর্তী প্রজন্মকে বঞ্চিত করতে হয়। কখনো সারা জীবনও দেনা অপরিশোধ থেকে যায়। এই চিন্তা কন্যা সন্তানের জন্ম দুশ্চিন্তার কারণ হয়।এমতাবস্থায় আজ সমাজের অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিগণও পরোক্ষে গুণাহগার হয়ে থাকে। (আফকারে মিল্লী-১২/২-৩; পৃ১৩৭)।

যৌতুক প্রথার কারণে পাত্রের অভিভাবক অবৈধ ভাবে লাভবান হয়, অন্যদিকে পাত্রীর অভিভাবককে নানা ভাবে অগ্রিম সঞ্চয়ের চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। বৈধ উপায়ের পথ ছেড়ে অবৈধ উপায়য়ের ছিদ্র খোঁজে। ফলে অপরাধের পথ খুলে যায়

এবং সামাজিক ভাবে বিশৃংখলার জন্ম হয়। যারা হারাম খায়, তাদের পোয়া ভারী হয়। (যৌতুক ও ইসলামী সমাজ-পৃ-৪৭) ভয়াবহ যৌতুক প্রসঙ্গ তুলে আব্দুর রহমান কুন্দু লিখেছেন: যৌতুকের ভয়াবহতা বর্ণনার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যৌতুকের আতঙ্কে দরিদ্র পরিবারের কন্যাগণ হতাশাগ্রস্থ হয়ে আত্মহত্যা, না হয় বিষ পান, না হয় নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যাচ্ছে। জন্মানোর পর তার পরিবারে যৌতুকের ব্যবস্থাপনা না থাকলে সে এই ছাড়া বিকল্প উপায় পায় না। (যৌতুকের অভিশাপ-পৃ-১৮) প্রকৃত কথা হলো, প্রকৃতি পুরুষকে উপার্জন করার যোগ্যতা,সামর্থ ও দায়িত্ব দিয়েছে। তাই স্ত্রীর আনা সম্পদের লোভ থাকা অনুচিত। এমতাবস্থায় যৌতুক প্রকৃতি বিরুদ্ধ এক ভ্রান্ত পন্থা। সমাজে যে ভাবে এর প্রচলন শুরু হয়েছে,তার বাস্তবতা নেই। দাতা গ্রহিতা উভয়েই গুণাহ করে।এই ধরণের সম্পদের চাহিদা ঘুষের নামান্তর।আল্লামা শামী, এই ধরণের উপার্জনকে সূদের ন্যায় বলে দেগেছেন। কুরআনে ইহুদী জাতির অপরাধের কথায় তারা নবীদের হত্যা যেমন করেছে তেমনি ঘুষ খেত বলে ঘৃণা ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী ﷺ বলেন :

لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت و كل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به (مشكوة

হারাম ঘুষের সম্পদে যে শরীর বৃদ্ধি পায় সেই শরীরের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। (মিশকাত)। অন্য হাদীসে আছে :-

لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام

'হারাম খাদ্যে বেড়ে ওঠা শরীর জান্নাতে যাবে না।' (মিশকাত)

যারা সারা জীবন ই হারাম খাদ্যের সন্ধানে থাকে তাদের ঈমান থাকার প্রশ্ন আসে না। বরং স্পষ্ট যে, তাদের নামায ও দুআ কবুল হয় না। যারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে অথচ গুণাহ করে যায়, আল্লাহর দরবারে গিয়ে কি জবাব দেবে? কবরের সাপ বিছে থেকে বাঁচার ন্যায় তাদের এমন গুণাহ থেকে বাঁচার আগ্রহ থাকা উচিত। বরং ভাবা দরকার যে, সাপ বিছের দংশনে পার্থিব ভাবে কিছু কষ্ট হয়, কিন্তু হারাম খাদ্যের জন্য পার্থিব এবং পরকালেও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।তবে আর একটা কথা এমন সময় ভাবিয়েও তোলে। অবৈধভাবে যারা সম্পদ আয় করে তাদের উপার্জনে বরকত হয় না। দ্রুত ক্ষয়ও হয়। যারা দান খয়রাত করে, আল্লাহ তাদের বিপদ মসীবত দূর করেন। কিন্তু সেখানেও তো সমস্যা হবে! আজকের ভারতীয় মুসলিম সমাজকে আত্মসমীক্ষা করতে হবে যে, যৌতুক বা বর পণের লেন দেন প্রথা তাদের পরকাল বিষয়টা কি কলুষিত

করছে না? এতে বাহ্যিক ভাবে সাময়িক লাভ দেখলেও পরকাল বরবাদ হচ্ছে। তাই সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের পরিকল্পিত উদ্যোগ এই পাপের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। ভারতের মুসলিম পার্সোনাল ল' কাউকে দায়িত্ব দেন, কোন কোন মুসলিম জামাআত উদ্যোগ নিচ্ছে, ভালো কথা, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সমাজের সচেতন ওলামাগণ, বক্তা, ইমাম ও সুশীল চিন্তাশীলগণকে এই জঘণ্য প্রথা দূর করার জন্য সোচ্চার হতে হবে। নিজেদেরকেও নমুনা হয়ে এমন রসম রেওয়াজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। সংগঠিত পরিকল্পনা মতো যদি উদ্যোগ নেওয়া হয়, আশাকরি এই জঘণ্য প্রথা থেকে সমাজকে রক্ষা করা যাবে।

ভারতীয় মুসলিম সমাজে নিছক যৌতুক বা বিবাহকালের কুপ্রথা নয় বরং অসংখ্য সমস্যা, যা সরাসরি সমাজকে ধ্বংস করে এবং আল্লাহর নীতিমালার বিরুদ্ধাচারণ করে। তার মধ্যে আছে মীরাস বা সম্পদের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ। এটা এমন এক বিষয়, ভারতীয় মুসলিম সমাজে যার স্বচ্ছ বন্টন হয় না, ব্যতিক্রম হিসাবে হলেও বাস্তবের প্রতিকূলতায় তাতে অনেক জটিলতা থাকে। প্রকারান্তরে তা পূর্বের অজ্ঞ সমাজের ন্যায় হয়। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন:

ماكان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية

যে মীরাস জাহেলী প্রথায় বন্টন হয়, তা জাহেলী বলে গণ্য হয়। (ইবনু মাজা) মীরাসের বিষয়ে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ সমস্যা জর্জরিত। কন্যার মীরাস বিষয়ে কতক মানুষ গুণাহগারও হচ্ছে। মেয়েদের হোক বা কোন ন্যায্য উত্তরাধিকারীর মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হারাম। সম্পত্তির বন্টন বিষয়ে আল্লাহ প্রত্যেককে ন্যায্য হিসাবে দিতে বলেছেন। যারা তা করে না তাদেরকে কড়াভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'যারা এই বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচারণ করবে এবং সীমালংঘন করবে, তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। তথায় অপমানকর শাস্তি পাবে।' (সূরা নিসা: ১৪)

এই আয়াতে মীরাস বন্টনে গরমিল করলে আল্লাহর ঘোষণা স্মরণযোগ্য। এর আলোচনায় সাইয়্যেদ আ: আ: মওদুদী (র) তাফহীমুল কুরআনে এ ভাবেই তাফসীর করেছেন: 'এটা একটা বড় ভীতিপ্রদ আয়াত। আল্লার নির্ধারিত মীরাসী আইনকে যারা পরিবর্তন করে কিংবা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত অন্যান্য

আইনের সীমা যারা লংঘন করে, এই আয়াতে তাদের জন্য চিরন্তন কঠিন আযাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এত কঠোর শাস্তি-বাণী উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ একেবারে ইহুদীদের ন্যায় পূর্ণ ধৃষ্টতাসহ আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করেছে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা সমূহকে লংঘণ করেছে। মীরাসী আইনের ব্যাপারে যে সব না-ফরমানী করা হয়েছে, তা আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের শামিল। কোথাও স্ত্রীলোকদের মীরাস থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথাও জেষ্ঠ্য পুত্রকে সমূহ সম্পত্তির মালিক বানানো হচ্ছে। কোথাও মীরাস বন্টনের নীতিকে প্রথম থেকেই বাতিল করে এজমালী পারিবারিক সম্পত্তি নীতি (joint family system) গ্রহণ করা হচ্ছে। কোথাও স্ত্রী পুরুষের অংশ সমান নির্ধারণ করা হচ্ছে। (তাফ: কুর: ঐ আয়াতের তাফসীর)।

মীরাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর يوصيكم الله 'তোমাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে 'বাক্যের মধ্যে আছে শাস্তির কড়া মনোভাব। যারা তার নীতির রদবদল বা অমান্য করবে, তাদের সতর্ক করেছেন যে, বিধানের হেরফের, রদবদল বা সীমা অতিক্রম মহা অন্যায়। 'এ সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জানেন'- এর অর্থ, কোন নির্দেশে মানুষের উপকার বেশী কিংবা পার্থিব ও পরকালের জন্য কল্যাণকর, আল্লাহ ও তার সর্বাধিক বেশী খবর রাখেন। এই বাস্তবতা লক্ষ্য করেই এমন বন্টননীতি পেশ করা হয়েছে। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর নির্দেশই তাদের কল্যান অকল্যানের উৎস ভেবে নিজেদের জীবন নির্বাহ করা। এই মৌলিক দৃষ্টিকোন উপেক্ষা করলেই ধ্বংস অনিবার্য। মীরাসের নীতিমালায় ইসলামের ঘোষণা ও আল্লাহর বর্ণিত সীমারেখার কয়েকটি মূল কথা হলো:- ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক বা নারীর দ্বিগুণ রেখেছে। কুরআন বলে :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিয়েছেন যে, পুরুষের অংশ দুই জন মহিলার সমান।' (সূরা নিসা: ১১)

এটাই মীরাসের জন্য মৌলিক দিগদর্শণ। বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয় যে, ইসলাম সম্পত্তিতে নারীকে অর্ধেক অংশ দিয়েছে। অনেক আধুনিক মন মানসিকতা সম্পন্ন ও মানবতাবাদী বলে কথিত শিক্ষিত মুসলিমও এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছে। অবশ্য বিষয়টি খোদ আল্লাহই নির্দিষ্ট বন্টন নীতি দান করেছেন, তাতে মৌলিক বিচক্ষণতা ও বাস্তবতা যে আছে, আমাদের তার উপলব্ধির চেষ্টা করা দরকার। যেমন,

(১) নারীর ক্ষেত্রে সংসারের আর্থিক কোন দায় দায়িত্ব রাখা হয়নি। তার

নিজস্ব ভরণ পোষণের দায়ও নয়। তার জন্যে সকল আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তার পিতা, স্বামী ও সন্তানের উপর। অর্থাৎ কেবল আর্থিক উপার্জন নিছক নয় বরং তার ভরণ পোষণের দায়িত্বও অন্যের উপর। নারীর আর্থিক উপার্জন সীমিত কিন্তু পুরুষের উপার্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃত। তার মধ্যে আছে স্ত্রীর ভরণ পোষণ, সন্তানের লালন পালন এবং পিতা-মাতার অসচ্ছলতা থাকলে তাদেরও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ভাবে স্বামীর আর্থিক দায়িত্ব ব্যাপক ও স্ত্রীর দায়িত্ব এক্কেবারে নেই। এমন প্রেক্ষাপটে দেখলে নারীর তুলনায় পুরুষকে দ্বিগুণ অংশ দেওয়ার ন্যায় সঙ্গত বাস্তবতা আছে।যারা নারী পুরুষের সমান অংশীদারীর দাবী করে,তারা বাস্তবতা ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচরণ করে।

(২) এ ছাড়াও নারীর সম্পদ প্রাপ্তির ভিন্ন জায়গা আছে। তারা দুই জায়গা থেকে অংশ পায়-পিতা এবং স্বামীর থেকেই সম্পদের মীরাস পায়। পুরুষের মাত্র এক জায়গায়-পিতার সম্পদে। এই বাস্তব প্রেক্ষিতে পুরুষকে দ্বিগুণ অংশীদার করাই বিবেচনা সম্মত হয়েছে। আবার কেউ নির্বুদ্ধিতা সুলভ প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু আর্থিক বহুমুখী দায়িত্ব পুরুষের, তাই তাকে আরো বহুগুণ অংশ দেওয়া দরকার। নারী যেমন স্বামীর অংশীদার, স্বামীও তো স্ত্রীর অংশীদার ? উভয় প্রশ্ন অবান্তর। কেননা আমাদের সমাজে মীরাস বা সম্পদের উত্তরাধিকার বন্টনের কোন নীতি ছিল না। যদিও সামান্য কিছু দেওয়া হতো, তাতে অনেক জটিল সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ নারীকে স্থাবর সম্পত্তিতে অংশ না দিয়ে অস্থাবর সম্পত্তি থেকে অংশ দেওয়া হোত। এটাও তো মারাত্মক প্রবনতা। আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করার ন্যায় এখানেও মীরাস থেকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির সমূহ সম্পদে পরিবারের সবার অংশ থাকে। কোন অংশ পৃথকভাবে কারো জন্য বরাদ্দ করা আদৌ ঠিক নয়। সঠিক নিয়মে পুত্র কন্যা সব সম্পদের উত্তরাধিকার হবে। এমন কি মা, স্ত্রী ও সন্তানের অংশে কোন বেনিয়ম করা ঠিক নয়।

আবার অনেক সময় পিতার জীবদ্দশায় পুত্র মারা গেলে পৌত্র বা নাতিকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়। অথচ সে তো নিকটাত্মীয়। মানবিকতা ও আত্মীয়তার ইনসাফ হলো এমন অবস্থায় তাদেরকে বিবেচনা ক'রে জীবন ধারণের ন্যায় সম্পদ দান করা। অথবা ন্যায্য অর্থ দান করা। একেবারে বঞ্চিত করা জায়েয বা বৈধ নয়। কোন কোন সময় সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দিয়েও এমন চাপ সৃষ্টি করা হয় যে, পারিবারিক মর্যাদা রক্ষায় আনুষ্ঠানিকতার ব্যয়ের জন্য কোন ভায়ের অনুকূলেই বোনদের উত্তরাধিকার থেকে নিরাশ করা হয়। বৈষয়িক কুট কৌশলে পিতার সম্পদ থেকে বোনদের বঞ্চণার শিকার হতে হয়। অথচ তা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ বলেন, ইসলামী আইন তো পিতার মৃত্যুর কারণে পৌত্রকে সম্পদে বঞ্চিত করেছে। ব্যাপারটা যথার্থ নয়।

ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ বরাবরই এ বিষয়ে স্পষ্ট করেছে যে, সম্পদ বন্টনের নীতিমালায় প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার মৃত্যুতে পুত্র সরাসরি সম্পদের অংশীদার হয় না ঠিকই কিন্তু সে ভিন্ন সূত্রে অংশীদার হতে পারে। বন্টণের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালায় এটা বাস্তব সম্মত। কিন্তু অসীয়ত হিসাবে সম্পদে অংশীদার হওয়ার বিকল্প নীতিমালা ইসলাম দিয়েছে। এবং এটাকে অবশ্য কর্তব্য (حقا على المتقين (২: ১৮০) বলা হয়েছে। এই বিষয়ের আলোচণা প্রসঙ্গে মাও: মওদুদী (র) রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় ভাগে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা করেছেন যে : আজকাল মীরাস বন্টণে একটা সচেতনতা বেড়েছে। এমন কি অনেকেই নিজেদের জীবদ্দশায়ও মীরাস বন্টন করে দিচ্ছে। এটাও ঠিক নয়। কেননা ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের অংশ বর্তায়। তবে কিছু অংশ দান বা হেবা করা যেতে পারে। কিন্তু মীরাস বন্টন করা যায় না। শরীয়ত সম্মত মীরাস বন্টণের নীতিমালা সম্পর্কে সন্তানদের শিক্ষাদান করে যাওয়া ভালো। নিজের নয় বরং নিজের পিতা মাতার সম্পত্তি শরীয়ত সম্যতভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা উচিত। আসলে শরীয়তের বিধান তার নির্দিষ্ট নিয়মে না রেখে নিজেদের মন মতো চালানো ঠিক নয়। অন্যথা তার অনুসরণে কৃত্তিমতা এসে যায়। আবার এমন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, কতক মানুষ অসীয়তের মাধ্যমে কোন কোন ছেলেকে বঞ্চিত করে অন্য ছেলেকে সম্পূর্ণ সম্পদ দান করছে। এটাও সম্পূর্ণ অন্যায়। আল্লাহ সন্তানদের জন্য নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন,তার ব্যতিক্রম করা যায় না। অবশ্য এমন প্রসঙ্গ থাকে যে, কোন সন্তান বিকলাঙ্গ, উপার্জনে সম্পূর্ণ অসহায়, তখন অন্য উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করেও পৃথক ভাবে কিছু করা যেতে পারে। অসীয়তেরও একটা নিয়ম নীতি আছে। উত্তরাধিকার যারা পাবে, তাদের জন্য অসীয়ত না করার বিষয়ে রাসূল-ﷺ সতর্ক করেছেন যে:-

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (ابو داود؛ ابن ماجه)

'আল্লাহ প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসীয়ত সঙ্গত নয়।' -(আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

অনেকেই সন্তানের অবাধ্যতায় কিংবা আল্লাহর নীতির বিরুদ্ধে চলায় তাকে নিজ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। এটাও সঠিক নয়। সে তার বৈধ অংশীদার হতে পারে। পিতার খুনি ভিন্ন এমন হয় না। সার কথা হলো, সন্তানদের ন্যায্যভাবে মীরাস দিতে হবে। এটা আল্লাহর দেয়া আইন, যা মেনে চললে কল্যান ও সাফল্য আছে। এর বিরুদ্ধাচারণ করলে ব্যর্থতা এবং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন: 'এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর

রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝরণাধারা বয়ে যাবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে আচরণ করবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লংঘণ করবে, তাকে আল্লাহ আগুণে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে সব সময় থাকবে। এটা তার জন্য অপমানকর শাস্তি বিশেষ। (নিসা-৪: ১৪)

আজ মুসলিম উম্মাহর সকলের উচিত, মীরাস বা উত্তরাধিকার বন্টণের মধ্য দিয়ে সমাজকে সঠিক ও আদর্শভাবে গড়ে তোলা। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার কোন রকম চেষ্টা না করা। এটাই আমাদের কল্যান ও শান্তির পরিবেশ পেতে সাহায্য করবে।

যৌতুক ও উত্তরাধিকারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড: মুহা: মুশতাক কারীমী
অনুবাদ: মোঃ তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩